আমাদের দেশের উন্নয়ন বিদেশি পুঁজি দ্বারা দেশের "সস্তাশ্রম" শোষণ করিয়ে হবে না, দেশের শ্রম যাতে দ্রুত শিক্ষিত হয়ে "দামী" হয়ে নিজেরাই উদ্যোগী-বিনিয়োগী হয়ে বিশ্ববাজার দখল করবার প্রতিযোগিতায় নামতে পারে সেজন্য আমাদের খুব জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সেই আগুন এখনো জ্বলছে: একুশ শতাব্দী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মোঃ আনিসুর রহমান

প্রথম আলো আমাকে অনুরোধ করেছে একুশ শতাব্দীতে মুক্তিযুদ্ধের কোন্ চেতনার বাস্তবায়ন দেখতে চাই সে সম্বন্ধে লিখতে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে আজকে তেমন স্পষ্টতা নেই। হয়তো কোনদিনই ছিল না। দেশের গঠনতন্ত্রের প্রথম সংস্করণে যে চারটি মূলনীতি স্থান পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে এই নীতিগুলি ধরা যেতে পারে। কিন্তু এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাষাই, যাদের সব কয়টির সংজ্ঞাও তেমন স্পষ্ট ছিল না। আমি আমার দ্বারা সম্পাদিত একটি সাম্প্রতিক বইতে প্রস্তাব করেছি যে, স্বাধীনতার পরে যে চেতনা নিয়ে দেশের বহু স্থানে জনসাধারণ ও তরুণ সমাজ নানান্ রকম গঠনমূলক কাজে নেমে গিয়েছিল সেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাটি থেকে উঠে আসা চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই অসাধারণ কাজগুলোর ওপর কিছু তথ্য ও কিছু আলোচনা এই বইটাতে রয়েছে- বইটার নাম *যে আগুন জ্বলেছিল: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ* (গণমুদ্রণ লিঃ আজিজ মার্কেট, ঢাকা, ১৯৯৭) কিন্তু আমার এহেন প্রস্তাবইবা সবাইকে মান্‌তে হবে কেন? তবে কথাটার একটা কোনো বাস্তব ভিত্তি নিয়ে তো আলোচনা করতে হবে। তাই আমি এই ভিত্তিটার ওপর দাঁড়িয়েই আমার আলোচনা করবো। পাঠকরা বইটা পড়ুন, পড়ে ভিত্তিটা স্বীকার করতে চান বা না চান সেই স্বাধীনতা আপনাদের নিশ্চয়ই আছে।

স্বাধীনতার পরে গুরুদাসপুরের "গণমিলন", সাভারের "গণস্বাস্থ্য প্রকল্প", ঠাকুরগাঁয়ের কুচবাড়ি-কৃষ্টপুর গ্রামের অভিনব সাক্ষরতা আন্দোলন, রংপুরের আশ্চর্য স্বনির্ভর আন্দোলন, দেশের অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের গঠনমূলক কাজে মাঠে নেমে যাওয়া এবং আরো কিছু উদ্যোগ সামগ্রিকভাবে যে চেতনাগুলি দেখিয়েছিল সংক্ষেপে সেগুলো হলো: ১. আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতাবোধ; ২. গঠনমূলক কাজে যৌথ উদ্যোগ; ৩. দৈহিক শ্রম দিতে গর্ব বোধ করা; ৪. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৈহিক শ্রম দান; ৫. ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সাথে সাথে উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণ; ৬. খুব তাড়াতাড়ি নিজ নিজ অঞ্চল থেকে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য সামাজিক আন্দোলন নামানো।

উপরোক্ত যুক্তিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে দাবিদার এই চেতনাগুলি কি আজো এ জাতির মধ্যে আছে? তরুণদের মধ্যে আছে? আমার সাম্প্রতিক তিনটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বল্‌ছে যে- আছে:

এক. গত ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রদের নিয়ে নবগঠিত "জন ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র" *যে আগুন জ্বলেছিল* বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা করে। এই আলোচনায় শিক্ষকরাই বেশি অংশ নেন। এর পরে এই বিভাগের ছাত্ররা আমাকে ফোন করে বলে যে ৪ মার্চ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বইটি নিয়ে আলোচনা করবে, এবং আমাকে এই আলোচনায় থাকতে আমন্ত্রণ জানায়। এই আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কথার মধ্যে বিশেষ দুটি কথা বলে, সে দুটি হলো:

(১) আমাদের ঐতিহ্যের এই উজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা এতদিন কোনো সরকারই জাতিকে জানায়নি কেন?

(২) বইটার নাম *যে আগুন জ্বলেছিল* কেন রাখা হয়েছে? আগুন এখনো জ্বলছে আমাদের ভিতরে। প্রেরণা পেলে আমরা *আবার নামতে প্রস্তুত।*

আমি উত্তরে প্রকাশ্যেই চশমা খুলে চোখ্ মুছেছিলাম।

দুই. গত বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আগত প্রাক পিএইচডি পর্যায়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সংলাপের ওপর কয়েকটা ক্লাশ নেই। ক্লাশে ছাত্রদেরই বলি উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে। সমাজের উন্নয়ন ও ব্যক্তির উন্নয়ন। ছাত্ররা বলে- ব্যক্তি যদি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার অবদান রাখে তাহলে তাতেই সমাজরে উন্নয়ন এবং ব্যক্তির উন্নয়ন দুটোই হবে।

আমি হা করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি-উন্নয়নের এ রকম সুন্দর সংজ্ঞা দিতে পারলে আমি নিজে তৃপ্ত হতাম। এ রকম ছাত্রদের কাছে আমিতো শুধু শিখতেই পারি।

ক্লাশ কয়টা শেষে একটা ছোট পরীক্ষা নেবার পর খাতা জমা দিয়ে ছাত্ররা আমাকে বলে "স্যার, আমরা আশা করেছিলাম, আপনি ৭৩ সালের মতো আমাদের গ্রামে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নেবেন"।

আমি লজ্জা পাই। আমার ছাত্ররা আমার কাছে গণজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তার থেকে শিক্ষা নেবার সুযোগ আশা করেছিল, আমি শিক্ষক হয়ে সে সুযোগ তাদের দিতে পারিনি।

তিন. গত মাসে আমি একটি গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার আমন্ত্রণে বগুড়ায় তাদের তিনদিনব্যাপী 'উজ্জীবক' প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে যাই। প্রশিক্ষণ নেবার জন্য উত্তর বাংলার প্রায় একশটি গ্রাম থেকে প্রায় পৌনে দু'শ প্রশিক্ষণার্থী এসেছিল যাদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এরা সকলেই সম্পূর্ণ নিজেদের খরচেই এসেছিল চেনা লোকমুখে শুনে যে, এখানে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে জনা তিরিশেক ছিল নারী। প্রশিক্ষণে আত্মশক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আত্মনির্ভরতার আদর্শ নিয়ে গ্রাম-উন্নয়নের কাজে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। মানুষের 'ক্ষুধা' দূর করা হবে এই কাজের লক্ষ্য-ক্ষুধা বলতে শুধু খাদ্যের ক্ষুধা নয়, আরো অন্যান্য ক্ষুধার কথা আলোচনা করা হয়, যার মধ্যে *মানুষের সৃষ্টিশীলতা চরিতার্থ করবার ক্ষুধা* বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। এবং এই কাজে উজ্জীবকদের এবং গ্রামে অংশগ্রহণকারীদের একেবারে কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হবে না এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা যেভাবে এই প্রশিক্ষণে সাড়া দেয় তা আমি আশা করতে পারিনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তারা একজনের পর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে, তাদের জীবন - দর্শন বদলে গেছে। তারা এখন থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও আত্মনির্ভর হবে এবং আত্মনির্ভর গ্রাম-উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের যোগযুক্ত (মবিলাইজ) করে উন্নয়ন-কাজ শুরু করে দেবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে তাদের বলা হয়, এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কি পেলো সে সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রিয়জনকে একটা চিঠি লিখতে এবং পরের দিন চিঠিটা সবাইকে পড়ে শোনাতে। পরের দিন অনেকেই তাদের চিঠি পড়ে, এবং সকলেরই বক্তব্য মোটামুটি একই ছিল। একটি টিপিকাল চিঠি ছিল এই রকম (স্বামীর কাছে স্ত্রীর চিঠি):

প্রিয়তম,

তুমি আমাকে এই প্রশিক্ষণে আসতে দিতে চাওনি, আমি একরকম জোর করে এসেছি। তুমি যে আমাকে আসতে দিতে না চেয়ে কী ভুল করেছিলে তা তুমি জান না। আমি ফিরলে দেখবে আমি কতখানি বদ্‌লে গেছি, আমার কতখানি আত্মবিশ্বাস হয়েছে। তুমি দেখবে আমি ফিরে এসে শুধু আমাদের পরিবারের জন্যই নয়, গ্রামের সকলের জন্য সবাইকে নিয়ে অনেক কাজ করব। তোমাকেও এই প্রশিক্ষণটা নিতেই হবে এবং আমার সঙ্গে এই কাজে নামতে হবে। আমার প্রাণভরা ভালোবাসা নিও।

ইতি- তোমার প্রিয়তমা।

গ্রামের মেয়ে যে তার এই মধুর চিঠি এভাবে সবাইকে পড়ে শোনাবে তাও আশা করি নি, এবং এরকম একটি নয়, বেশ কয়েকটি চিঠি পড়া হয় সেখানে। এর থেকে এদেশে নারীরা মানসিক মুক্তির পথে কতটা এগিয়েছে তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু একথা এখন থাক্। এদেশের মানুষ তরুণ-তরুণী বাইরে থেকে অর্থসম্পদ ছাড়াও উন্নয়নের কাজে এগিয়ে যেতে যে প্রস্তুত রয়েছে, শুধু যে তারা চায় প্রেরণা, যেমন প্রেরণা তারা পেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে এবং দেশকে স্বাধীন করতে পেরে, একথা তাদের সঙ্গে মিশলেই জানা যায় একথাই আমার এখানে মূল বক্তব্য।

আমার মনে প্রশ্ন আসে, প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে অনেকের সাহচর্যে এসে একটা বিশেষ ধরনের স্পন্দনে আন্দোলিত হয়ে অনেক রকম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে ফিরে গিয়ে বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে এরকম প্রেরণার কতখানি বেঁচে থাকে? এটি

একটু যাচাই করবার জন্য আমি গাইবান্ধার দুটি গ্রামে সংক্ষিপ্ত সফরে যাই, যেখানে আগে এরকম প্রশিক্ষণ নেওয়া উজ্জীবকরা কাজ করছে। একটি গ্রামে যেখানকার উজ্জীবক মাত্র দুমাস আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সেখানে এই উজ্জীবকের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে গ্রামের সর্বমোট একশটির মতো ঘরের প্রত্যেকটি ঘরে সুন্দর করে শাকসব্জীর চাষ শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় গ্রামটিতে উজ্জীবক নিজে একজন চাষী, সে অন্য চাষীদের যোগযুক্ত করে তাদের জমি যখন পানিতে ডুবে যায় তখন সেই পানিতে যৌথ মাছের চাষ শুরু করেছে একটি সংগঠন করে এবং সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মাছচাষের জন্য শেয়ার বিক্রি করে। এবং এরা এখন আলোচনা করছে তাদের গ্রামের একদল দরিদ্র মহিলা একটি বিখ্যাত ঋণদান সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে যে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়। আমি এই ঋণী মহিলাদের সঙ্গেও দেখা করি এবং তাদের করুণ কাহিনীগুলি শুনি। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে এই কাহিনী শুনে যে, একটি মহিলা অন্য কোনোভাবে ঋণের কিস্তি শোধ দিতে না পেরে তার এক মাসের ছেলেকে একশ টাকায় বিক্রি করে কিস্তি শোধ দিয়েছে। আর একজন মহিলা নাকি কিস্তি শোধ না দিয়ে মারা গেলে তার মরদেহ কবর দিতে দেওয়া হয় নি যতক্ষণ তার আত্মীয় কেউ কিস্তি শোধ করে না দেয়। আর দুজন মহিলা নাকি কিস্তি শোধ দিতে না পেরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ নাকি সুদী মহাজনদের কাছ থেকে প্রথাগত চড়া সুদে ঋণ নিয়ে এই সংস্থার কাছে ঋণের কিস্তি শোধ করেছে। আমার সঙ্গে এই গ্রামের উজ্জীবক চাষীর এ ব্যাপারে কিছু কথা হলো এবং সে আমাকে বল্‌লো যে তাদের সংগঠন আলোচনা করছে এই মহিলারা তাদের ঋণের টাকা কোন সুচিন্তিত যৌথ উদ্যোগে খাটিয়ে ঋণ শোধ দিতে পারে কিনা অথবা ঋণ না নিয়েই কোনো যৌথ প্রকল্প নিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে কিনা এবং এ ব্যাপারে চাষীদের সংগঠন এই মহিলাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারে এসম্বন্ধে তারা আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবে। পথ চল্‌তে চল্‌তে পাশের আর এক গ্রামের উজ্জীবকের উদ্যোগের কথাও শুনলাম। সেখানেও চাষী-উজ্জীবকের উদ্যোগে জলা জমিতে যৌথ মাছ চাষ শুরু হয়েছে, এবং এখানে ভূমিহীনদেরও একশ টাকা করে শেয়ার দেওয়া হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে। সারা দেশ জুড়ে এরকম অসংখ্য উদ্যোগ চল্‌ছে যে উদ্যোগগুলি আমাদের আশা, আমাদের মাথা উচুঁ করে উঠে দাঁড়াবার সম্বল, আমাদের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। কয়দিন আগে (৩ ডিসেম্বর) মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে নারীরা উন্নয়নের ওপর এক কর্মশালায় দেশের একটি নারী সংস্থার ডিরেক্টর বলেছিলেন যে, উন্নয়ন শুরু হয় নিজেদের যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে যাওয়া থেকে। এই ডিরেক্টরও এক তরুণী। দেশের অগণিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই স্পন্দিত হয়ে চলেছে অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও। একদিকে উন্নয়নের নামে মানুষের পরমুখাপেক্ষী করে বসিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা, মনুষ্যত্ব বিধবংসকারী ঋণ প্রকল্প; অন্যদিকে আত্মশক্তির প্রেরণায়, আত্মনির্ভর হয়ে আত্মসম্মানে মাথা উচুঁ করে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা, এবং এদিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দেশের তরুণ-তরুণীর আকাঙক্ষা। যে আশাজনক উদ্যোগগুলো চলছে সেগুলো অনেক হলেও বড়ো করে দেখা যাচ্ছে না এগুলোর প্রচার হচ্ছে না বলে। যদি এগুলো সবাইকে দেখানো যায় এবং একই সঙ্গে দেশের এগুলো থেকে তরুণী-তরুণীদের প্রতিক্রিয়া আহ্বান করা যায় তাহলে দেখা যাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখনো কিরকম জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, এবং এই চেতনার মধ্যেই দেখা যাবে একুশ শতকে দেশের গর্বের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎকে সম্ভব করা কঠিন কিছুই নয় যদি দেশের তরুণরা শুধু যে প্রেরণাটুকু চাচ্ছে সেটুকু তাদের দেওয়া যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আমি বলেছিলাম, তোমরা দেশের উন্নয়ন সমন্ধে তোমাদের মনের কথা পত্র-পত্রিকায় লেখ না কেন? তারা জবাব দিয়েছিল “স্যার, কাগজে আপনার লেখা ছাপ্‌বে, আমাদের লেখা ছাপ্‌বে না”। *প্রথম আলো* কি এই ট্র্যাডিশন্ ভাঙতে পারে না? প্রথম আলো কি শুধু আমার মতন মুরব্বীস্থানীয় অকাজের লোকদেরই তার কলাম ভর্তি করতে লিখতে বলবে, বিশেষ করে লিখ্‌তে আমন্ত্রণ জানাবে, না আগুনটা দেখাবার প্রেরণা তার মধ্যেও আসবে? তার হাতে দেশব্যাপী যে সাংবাদিক নেটওয়ার্ক আছে এই আগুনটা একটি নিয়মিত কলামে দেশের তরুণ-তরুণীদের এ নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা এবং প্রিয়তম-প্রিয়তমাদের এরকম কাজে শরীক করবার জন্য মধুর আহ্বান ছাপাবার আমন্ত্রণ কি জানানো যায় না? এই পত্রিকার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তো পত্রিকার প্রকাশক মাহ্‌ফুজ আনাম বলেছিলেন বাংলাদেশের আত্মসম্মান বাড়াবার লক্ষ্যে এই পত্রিকা কাজ করে যাবে। একুশ শতকের দরজায় এসে এই আগুনটাই *প্রথম আলো* হোক্ না কেন। আর যে সমস্ত সংস্থা ও যারা মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে উজ্জীবিত করছেন [illegible]ও বল্‌বো, একাজ সবার দৃষ্টিতে আসে সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য একাজের ডকুমেন্টেশন্ করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা ছাড়াও এরকম চিন্তা করা যেতে পারে যে, একটি বড়ো অঞ্চল জুড়ে অথবা অনেকগুলি গ্রামে একসঙ্গে কোনো মূল্যবান ও অনুপ্রেরণাময় কাজ হয়ে যেতে পারে কিনা এব্যাপারে উজ্জীবকদের সঙ্গে আলোচনা করা ও তাদের প্রেরণা দেওয়া। এতে আত্মনির্ভর কাজের এরকম সাফাল্য সহজেই দেশের সকলের চোখে পড়বে এবং দেশের সার্বিক দেশপ্রেমিক মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস আন্‌তে সাহায্য করবে যে, এ জাতির উন্নয়নের জন্য বিদেশীদের কাছে নতজানু হবার কোনো প্রয়োজন নেই-যেভাবে আমরা বর্তমানে নতজানু হয়ে আছি।

এরকম বড়ো অঞ্চল জুড়ে *গণশিক্ষার আন্দোলন* সহজেই হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় জিততে হলে সমস্ত জাতির খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষিত হয়ে উঠে দাঁড়াবার কোনো বিকল্প নেই-একথা একাত্তরের তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা ও দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝেছিল বলে স্বাধীনতার পরে দেশের এত জায়গায় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণকে স্বাক্ষর করাবার উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই কাজ নানা কারণে সেদিন সমাপ্ত হতে পারে নি। আর আজকে স্বাক্ষরতা মানে শুধু টিপ্‌সই-দূর নয়, দেশের সার্বিক জনগণের দৈনিক পত্রিকা পড়বার সমমানের ক্ষমতা না হলে আমরা একুশ শতাব্দীতে অপূরণীয় একটা হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে প্রবেশ করবো। এদেশে সত্যিকার গণতন্ত্র আসবে না দেশের সার্বিক জনগণের শিক্ষার মান এই পর্যায়ে না আন্‌তে পারলে, যাতে শুধু নির্বাচনে ভোটের ও কালো টাকার খেলা নয় , জনগণ তাদের কাছে সরকারি ও বিরোধীদলের জবাবদিহিতার প্রশ্নে সংবাদপত্রের ‘মুক্তচিন্তা’ র কলাম বুদ্ধিজীবীদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে এই কলামে তাদের নিজস্ব স্বাধীন মতামত রাখতে পারবে, এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সরকারি নীতি-দুর্নীতি ও প্রকল্পের ওপর তাদের নিজস্ব মতামতের ঢেউ তুলতে পারবে। পরবর্তী পর্যায়ে, এবং তাও যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, জনগণের একটি বড় অংশকে কম্পিউটার ট্রেনিং দেবার আন্দোলনে নামাতে হবে বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার জন্য। আমাদের দেশের উন্নয়ন বিদেশী পুঁজি দ্বারা দেশের“সস্তাশ্রম” শোষণ করিয়ে হবে না, দেশের শ্রম যাতে দ্রুত শিক্ষিত হয়ে “দামী” হয়ে নিজেরাই উদ্যোগী-বিনিয়োগী হয়ে বিশ্ববাজার দখল করবার প্রতিযোগিতায় নামতে পারে সেজন্য আমাদের খুব জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এ কাজ কেবলমাত্র সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই যত দ্রুত প্রয়োজন ততো দ্রুত সমাধা হতে পারে, তাই এই কাজের দায়িত্ব দেশপ্রেমিক তরুণসমাজ ও ছাত্রছাত্রীদেরই হাতে। তাদের এ ব্যাপারে বড়ো রকমের কিছু করতে যারা প্রেরণা যোগাতে পারবে তাদের কাছে এই জাতির ঋণ অপরিশোধ্য হয়ে থাকবে।

মো: আনিসুর রহমান : অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য।

চিঠিপত্র

‘সেই আগুন জ্বলছে...’

বহুল প্রচারিত প্রথম আলোয় প্রকাশিত মো: আনিসুর রহমানের ‘সেই আগুন জ্বলছে...’ লেখাটি পড়ে আনন্দিত হয়েছি। উক্ত লেখায় তিনি গত মাসে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত এই প্রশিক্ষণে সুদূর নড়াইল থেকে আমি ৭০ বছর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক এবং আমার ১১ জন তরুণ সহযোগী অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই প্রশিক্ষণ আমাদের হৃদয়ে যে আগুন এতোদিন লুকায়িত ছিল তা দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে গতানুগতিক বিদেশী সাহায্য নির্ভর, দাতাগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত ‘উপকার ভোগী’ সৃষ্টিকারী গতানুগতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হই। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য একটি আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য আমার মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হয়। আবার যেন মুক্তিযুদ্ধের সময়কার আত্মবিশ্বাসী চেতনা ও মানসিকতা আমার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এই প্রশিক্ষণটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বস্তরের জনগণ বিশেষত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিচালনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা তথা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনে এরকম কর্মশালা আমাদের প্রস্তুত করবে।

এস এম ওয়ালিউর রহমান
নোয়াগ্রাম, লোহাগড়া
নড়াইল।

৮ই ফেব্রুয়ারি ৯৯
প্রথম আলো